১৪-৩-২০১৪

কেন সুপ্রিমকোর্ট নির্বাচন কমিশন ও সংবাদমাধ্যমকে দোষারোপ করা হচ্ছে

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

বিগত ২৪ ঘন্টায় আমি দুটো জরুরী উক্তি শুনেছি যাতে আমি চিন্তিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরসিদ লন্ডনে একটা বক্তব্য রেখেছেন। এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ভারতে সুপ্রিমকোর্ট ও নির্বাচন কমিশন তাদের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করছে। তিনি বিশ্বাস করেন, নির্বাচিত নন এমন লোকজন কখনই ভারতীয় গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননা কারণ এখানে সবসময়ই সার্বভৌম ইচ্ছা প্রকাশ হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা।এই যুক্তি একইসঙ্গে ভ্রান্ত ও বিপথগামী।

ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন খুব স্পষ্ট। আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব আদালতের। আইনসভার তৈরি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখতে পারে আদালত। প্রশাসনের কাজকর্মও খতিয়ে দেখার ক্ষমতা রয়েছে আদালতের। প্রশাসনের এক্তিয়ারও নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে আদালতের। সাধারণত প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনা আদালত। নীতি নির্ধারণ প্রশাসনের কাজ। আইন তৈরির দায়িত্ব আইনসভার। কিন্তু অসাংবিধানিক কিছু রোধের ক্ষমতা রয়েছে আইনসভার।আইনের শাসন মেনে চলার জন্য প্রশাসকদের নির্দেশ দিতে পারে আদালত। প্রশাসনিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ আছে কিনা তা নিশ্চিত করার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারে আদালত।সমস্ত সিদ্ধান্তের পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা চাই।আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাংবিধানিক প্যারামিটারও নির্দিষ্ট করতে পারে। এটাকে আমরা বিচারকের দ্বারা নির্দিষ্ট আইনও বলতে পারি।এটা সত্য যে প্রশাসনের জন্য বিধি, আইন ও নির্দেশিকা দিতে পারে সুপ্রিমকোর্ট। সামপ্রতিক কালে বিচারবিভাগের কিছু রায়ে ক্ষমতা বিভাজন খর্ব হয়েছে। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম। নৈতিক অবনতিও বলা যেতে পারে।কিন্তু তা কখনই ভারতের বিচারবিভাগের কার্যাবলীর স্বাভাবিক দিক নির্দেশ করেনা।

বহু বছর আগেই বিকশিত হয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত কমিশনের উপর। এই দায়িত্ব কমিশন খুব ভালভাবেই পালন করে।ভারতের গণতন্ত্র বেঁচে আছে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন ও স্বাধীন বিচারবিভাগের জন্য। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্র- এগুলি ভারতে গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে আরও মজবুত করেছে। নির্বাচনী আচরণবিধি প্রাথমিকভাবে লিখিত আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। সংবিধানের ৩২৪

ধারা অনুযায়ী এখন এটা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত।২০০২ এ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মঞ্জুরিও পেয়েছে তা। এর প্রথম কারণ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনী আচরণবিধি চালু করা সরকারের কাছে খুব একটা সহজ নয়। মন্ত্রিসভার একজন বর্ষীয়ান সদস্যের পক্ষে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।ভারতের গণতন্ত্র মজবুত করার ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বিরক্তিকর দ্বিতীয় মন্তব্যটি করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদী সংবাদমাধ্যমকে চালনা করছেন। এবং সংবাদমাধ্যমই মোদী ঢেউ নিয়ে উন্মাদনা তৈরি করছে। মিডিয়ার বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে খবর তৈরিরও অভিযোগ এনেছেন তিনি। জনগণ তাঁর এই মন্তব্যে বিরক্ত এটা বুঝতে পেরে এখন তা পুরোপুরি অস্বীকার করছেন নরেন্দ্র মোদী।

জনপ্রিয়তা দিয়ে শুরু করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবির্ভূত হয়েছিলেন জননায়ক হিসেবে। প্রমাণ ছাড়াই একজন বা সবার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে গেছেন তিনি।সত্য নিয়ে তাঁর মাথাব্যাথা খুবই কম। বারবার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ায় তিনি বিশ্বাসী। তাঁর তৈরি তথ্য সবই সত্যি বলে বিশ্বাস করেন তিনি। বহু ক্ষেত্রেই তিনি আদর্শহীন। তথ্য তুলে ধরার আগে মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখেন তিনি।গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এধরণের মানুষ খুবই মারাত্মক। তাঁর বক্তব্য হল " মিডিয়াকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে কারণ মিডিয়া সততার ধার ধারেনা। অসততা কেন ? না মিডিয়া এটাই দেখাচ্ছে যে ভোটযুদ্ধে অনেকটা এগিয়ে থেকে শুরু করছেন মোদী।" তাঁর বলা অনেক কথা যা ক্যামেরায় রেকর্ড করা আছে তা অবলীলায় অস্বীকার করতে পারেন তিনি।

বিচারবিভাগ,মিডিয়া, ও নির্বাচন কমিশনের মত গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর সলমন খুরসিদ ও কেজরিওয়াল এত ক্ষিপ্ত কেন ? এই সমলোচনা কখনই পরিণত রাজনীতির পরিচয় দেয়না। জয় ও পরাজয় নির্বাচনের একটা অংশ বিশেষ। ভারত ও তার গণতন্ত্র অমর। কিন্তু মানুষ তা নয়। নির্বাচনে হারের আশঙ্কায় সলমন খুরসিদ ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এতটা হতাশ হওয়া উচিৎ না যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে আপস করবেন তারা।